HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০১ বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
টপিক ০২: বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
টপিক ০৪: বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা
টপিক ০৫: সড়কপথ
টপিক ০৬: রেলপথ
টপিক ০৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান
টপিক ০৮: বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান
টপিক ০৯: বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব
টপিক ১০: বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর
টপিক ১২: বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ
টপিক ১৩: বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব
টপিক ১৪: বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ। এদেশের অধিকাংশ স্থান সমতল। অসংখ্য নদী জালের মতো এদেশকে জড়িয়ে আছে। এ কারণে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ আজ থেকে ৪০/৫০ বছর পূর্বেও জলপথই ছিল বাংলাদেশের অধিবাসীদের যাতায়াতের প্রধানতম মাধ্যম। কিন্তু পরবর্তীকালে এদেশের অন্যতম প্রধান নদী পদ্মার উজানে বাঁধ নির্মাণসহ অন্যান্য নদীতে নানাবিধ স্থাপনা স্থাপন করার ফলে এবং সময়মতো ড্রেজিং না করায় অধিকাংশ নদ-নদী আজ মৃতপ্রায়। অপরদিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন উন্নতমানের রাস্তা নির্মাণ ও যানবাহনের আধিক্যের কারণে সড়কপথ এদেশবাসীর কাছে যাতায়াতের প্রধানতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সকল বিভাগীয় জেলা শহর তো বটেই, এমনকি প্রায় সকল উপজেলা সদরেও উত্তম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

সড়ক পরিবহন বাংলাদেশে স্থলপথে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম। সড়কপথ ছাড়াও স্থলপথে রেলপথ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম। যদিও বাংলাদেশে রেল ব্যবস্থা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। দ্রুত যাতায়াতের জন্য আকাশপথ খুব কার্যকর হলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে পরিবহনের এই মাধ্যম খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

স্থলপথ (Land Transport)

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থলপথের ভূমিকা সর্বাধিক। নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং আরামদায়ক গাড়ি ব্যবহার মানুষকে যাতায়াতে স্থলপথ ব্যবহারে অধিক উৎসাহী করে তুলছে। বাংলাদেশে স্থলপথের পরিবহন ব্যবস্থা আবার ২ ধরনের। যথা- সড়কপথ এবং রেলপথ।

সড়কপথ (Roads): স্থলপথের মধ্যে সড়কপথ আমাদের দেশের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা পাকা সড়ক দ্বারা সংযুক্ত। এ দেশের যেকোনো অঞ্চল থেকে গড়ে ৫ কি.মি এর মধ্যে কোনো না কোনো রাস্তা পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের সড়কপথ পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ সড়কপথ স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, আমাদের দেশে ৩,৯৯১ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ৪,৮৯৮ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩,৫৮৭ কি.মি. জেলা সড়কসহ সর্বমোট ২২,৪৭৬ কি.মি. সড়কপথ বিদ্যমান আছে। রাজধানী ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের প্রায় সর্বত্র যাওয়া যায়।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেলপথ (Railway): বাংলাদেশে স্থলপথে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সাশ্রয়ী মাধ্যম হলো রেলপথ। সারা বিশ্বে রেল যাতায়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে রেলপথ তেমন বিকাশ লাভ করেনি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৩১০১ কি.মি. রেলপথ আছে। এদেশের রেলপথ আবার তিন শ্রেণির। ১ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট রেলপথ মিটারগেজ ও ১.৬ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট রেলপথ ব্রডগেজ নামে পরিচিত। এছাড়াও রয়েছে ডুয়েলগেজ রেলপথ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫৪১ কি.মি. ডুয়েলগেজ, ৮৮০ কি.মি, ব্রডগেজ এবং ১৬৮০ কি.মি. মিটারগেজ রেলপথ আছে। পূর্বে যমুনা নদীর কারণে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু যমুনা সেতু চালু হওয়ার ফলে এখন সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। ২০১৬ সালে রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যমে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

নদীপথ (River Ways)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের সর্বত্র অসংখ্য নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নদীপথে পণ্য যাত্রী পরিবহন সবচেয়ে সস্তা। বাংলাদেশে অসংখ্য খাল-বিল ও নদী মিলে প্রায় ৮,৪০০ কি.মি দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৩,০০০ কি.মি জলপথ কেবলমাত্র বর্ষা মৌসুমে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ চলাচলের বেশি উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২১ টি লঞ্চঘাট, ১৪৮টি ফেরি, ১৪০টি পন্টুন ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত ১২টিসহ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ৩৫টি ফেরিঘাট আছে। এদেশের অসংখ্য বন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরিগঞ্জ, মোহনগঞ্জ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জলপথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লঞ্চ, স্টিমার, সি-ট্রাক, কার্গো, ট্রলার, দেশীয় নৌকা প্রভৃতি যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে থাকে।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিমান পথ (Air Ways)

দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত যাতায়াতের জন্য একমাত্র মাধ্যম হলো বিমান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার নাম 'বাংলাদেশ বিমান'। দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের বিমান সার্ভিস চালু আছে। অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলো হলো: (১) তেঁজগাও বিমানবন্দর, ঢাকা (২) শাহ মাখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী (৩) ঈশ্বরদী বিমানবন্দর, পাবনা (৪) যশোর বিমানবন্দর (৫) সৈয়দপুর বিমানবন্দর, নীলফামারী (৬) কক্সবাজার বিমানবন্দর (৭) বরিশাল বিমানবন্দর।

অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে বিমানে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রাজশাহী, সৈয়দপুর, যশোর প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। (১) হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, (২) ওসমানী বিমানবন্দর, সিলেট এবং (৩) হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম। এই সমস্ত বিমানবন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিমানের পাশাপাশি একাধিক বেসরকারি সংস্থার বিমানও চলাচল করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০২ বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রয়াস বর্তমানে বেশ জোরেশোরেই চালানো হচ্ছে; নির্মিত হয়েছে ফ্লাইওভার, পদ্মাসেতু, মেট্রো রেল। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Characteristics of the Transport System in Bangladesh)

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব: বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার, সম্প্রসারণ, যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ, মেরামত, দক্ষ জনবল তৈরি, উন্নত ইঞ্জিন সংগ্রহ, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ তথা পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাব বেশ লক্ষণীয়।

২. প্রকৃতি প্রদত্ত জলপথ: বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের ছোট, বড় অসংখ্য নদ-নদী পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এদেশে জলপথ স্বল্প ব্যয়ে ব্যবহারযোগ্য পরিবহন মাধ্যম। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলপথ অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রায় ৮,৪০০ কি.মি নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫,৪০০ কি.মি জলপথ সারা বছর ব্যবহৃত হয় এবং ৩,০০০ কি.মি জলপথ ঋতুভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

৩. অদক্ষ ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন খুবই অদক্ষ। পরিবহন ব্যবস্থার এটি একটি নেতিবাচক দিক। পরিবহন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রায়ই যাত্রীরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। এমতাবস্থায় ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়োগ করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

৪. সড়কপথের স্বল্পতা: বাংলাদেশে সড়কপথ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। এদেশে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল থাকায় সড়ক নির্মাণ ব্যয়বহুল। অনেক সময় সেতু না থাকার কারণে যানবাহন ফেরীতে পারাপার করতে হয়। বর্তমানে এদেশে প্রায় ২২,৪১৯ কি.মি পাকা ও পিচ ঢালা সড়ক রয়েছে। যদিও ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের সর্বত্র যাওয়া যায়।

৫. পরিবহন দুর্ঘটনা: বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পরিবহন দুর্ঘটনার হার অত্যন্ত বেশি। এর মূলে রয়েছে গাড়ি চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো, যান্ত্রিক ত্রুটি, চালকের অদক্ষতা, ট্রাফিক আইন মেনে না চলা, পরিবহনের অবকাঠামোগত সমস্যা। সুতরাং পরিবহন দুর্ঘটনা পরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

৬. রেলপথের অপর্যাপ্ততা: রেলপথের অপর্যাপ্ততা বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ০.০২ কি.মি রেলপথ রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ রেলপথ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। স্থলপথে ভারী মালামাল এবং অধিক যাত্রী পরিবহনের প্রধান উপায় রেলপথ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে রেলপথের অপর্যাপ্ততা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে।

৭. সুযোগ-সুবিধার অভাব: পরিবহন ক্ষেত্রে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেক স্টেশনে যাত্রী ছাউনি, বিশ্রামাগার ও আচ্ছাদিত প্লাটফর্ম নেই। এমনকি পরিবহনের অভ্যন্তরে নোংরা ও ভাঙা আসন, বাথরুমে পানির অভাব, অকেজো পাখা ও লাইন দেখা যায়। অতএব দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of Transport and Communication System in Bangladesh's Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হলো তার পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল ও মালামাল আনা নেওয়াসহ সব ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করাকে বুঝায়। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদান করা, আপনজনের খবরাখবর, বিশ্বের সাথে পরিচিত হওয়া সবই দ্রুত সম্পন্ন করা যায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

২. ব্যবসায়িক যোগাযোগ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসা সংক্রান্ত সার্বিক যোগাযোগ ও এর উন্নয়ন সাধন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন: যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম রেডিও-টিভির সাহায্যে কৃষক ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের উন্নত চাষাবাদ এবং বিনিয়োগ কৌশল শিক্ষাদান করে দেশে কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন সাধন করা যায়।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

৪. প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন: যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ ও উদ্দেশ্য, আদেশ, নিষেধ প্রভৃতি জনগণকে সঠিক সময়ে অবহিত করানো সম্ভব। এর ফলে জনগণের সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক নিবিড় হয়।

৫. আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা স্থাপন: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা যায়। এতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। সুতরাং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রাখে।

৬. বিনোদনের মাধ্যম: রেডিও টেলিভিশনের ন্যায় গণসংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে সেগুলোর সাহায্যে জনগণকে জাতি গঠনমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার জনগণকে কর্মচঞ্চল রাখতে সহায়তা করে।

৭. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগাযোগ: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশি মিশনগুলোর সাথে স্বাধীনভাবে দ্রুত ও কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা যায়। এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রসার লাভ করার সম্ভাবনা থাকে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

৮. মানবাধিকারমূলক কর্মসূচি জোরদার: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করে মানবতার পক্ষে জনমত গঠন করা যায়।

৯. উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ; দেশের সার্বিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সমস্যা ও উন্নয়নমূলক খবরাখবর আদান-প্রদান, অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের গতি প্রবাহ ও এর বিকাশ সাধনে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাধ্যম।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পিছনে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক ও উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

যেকোনো দেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চল; টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের ভাওয়াল ও মধুপুর গড়; দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবন এবং দক্ষিণ অঞ্চলের নদীবহুলতা এদেশের ভূপ্রকৃতিকে শুধু বৈচিত্র্যময় করেনি বরং এগুলো এদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি-

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Physical Environment)

পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবকে আমরা কতকগুলো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। যেমন-

ক. ভূপ্রকৃতি: সমতল ভূমিতে সড়ক নির্মাণ সহজসাধ্য এবং কম ব্যয়বহুল।

পক্ষান্তরে বন্ধুর ভূপ্রকৃতি বিশিষ্ট পাহাড়ি অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ জায়গা সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত বলে সড়কপথে দেশের প্রায় সর্বত্র যাওয়া সম্ভব। কিন্তু দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল দুর্গম পাহাড়ি বলে সেখানে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আবার দক্ষিণাঞ্চল নদীবহুল বলে সড়কের উপর প্রচুর ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ভূপ্রকৃতি কেমন হবে তার উপর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভর করে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

খ. নদ-নদী: কোনো অঞ্চলে নদ-নদী বেশী হলে সেই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌপথ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের (বরিশাল, ভোলা) কথা বলা যায়। এই অঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট বা রেলপথ তৈরি করতে হলে প্রচুর ছোট বড় সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করা প্রয়োজন যা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বরং স্বল্প ব্যয়ের জলপথভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এই অঞ্চলের যাতায়াতের প্রধানতম মাধ্যম।

গ. বৃষ্টিপাত: বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। আর সড়ক পথ নির্মাণে জলবায়ু তথা বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে হালকা মাটি অতি সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত, বিধৌত ও স্থানান্তরিত হয়। ফলে প্রতিবছর সেই সমস্ত অঞ্চলে সড়ক সংরক্ষণে, এর উপর নতুন করে মাটি ফেলতে হয়। এজন্য বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে সড়ক নির্মাণের সময় উপাদান (যেমন- পিচ ঢালা পথ বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না) নির্বাচনে অধিক সতর্ক থাকতে হয়।।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

ঘ. কৃষিজমির অবস্থান: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। সড়ক পথ নির্মাণে বা বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন। আবার কৃষকের উৎপাদিত ফসল জমি থেকে ঘরে বা বাজারে নেওয়ার জন্য রাস্তা প্রয়োজন। এ কারণে যেখানে অনেক কৃষিজমি থাকে সেখানে বড় রাস্তা নির্মাণ না করে ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

ঙ. বনভূমির অবস্থান: বড় বড় সড়ক নির্মাণে অনেক জমির প্রয়োজন হয়। এ কারণে যে সমস্ত অঞ্চলে বনভূমি আছে সেই বনভূমি যেন কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। কেননা পরিবেশ রক্ষায় বনভূমির কোনো বিকল্প নেই। বনভূমির মধ্যে বা পাশ দিয়ে যদি সড়ক নির্মাণ করা হয় তাহলে একদিকে যেমন বনভূমির আয়তন কমে যায়, অন্যদিকে সড়ক চলাচলকারী যানবাহনের শব্দে বনের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। ফলে বনের জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেতে পারে। এ কারণেই আমাদের দেশে সুন্দরবনের ক্ষতি করে কোনো সড়ক নির্মাণ করা হয় নি।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

সামাজিক প্রভাব (Influence of Man Made Environment)

পরিবহন ব্যবস্থায় কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, একই সাথে সামাজিক পরিবেশও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন-

ক. জনবসতি: মানুষের যাতায়াত বা পণ্য পরিবহন বা অন্য কোনো সুবিধার জন্যই যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি। তাই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে জনবসতিকে কেন্দ্র করে। এদেশের বড় বড় জনবসতি যেমন- জেলা ও বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম), বন্দর (চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ) প্রভৃতি সড়ক, রেল, জলপথ দ্বারা অর্থাৎ উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা: যেকোনো ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে অর্থের প্রাচুর্য না থাকায় অনেক জায়গায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সড়ক ও রেলপথ ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কথা বলা যায়। এর অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হলেও স্বাধীনতার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর পেরিয়ে যাচ্ছে এর বাস্তবায়নে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

গ. সংস্কৃতি: পরিবহন ব্যবস্থার উপর সংস্কৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। জাতি হিসেবে আমরা অনেক অসচেতন। এ কারণে একই রাস্তার একই লেনে বিভিন্ন গতির যানবাহন চালানো এবং রাস্তার উপর যত্রতত্র পার্কিং আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে। এছাড়া সড়ক পথের এত বহুমুখী ব্যবহার বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। এই জনপথগুলোকে আমরা মিছিল মিটিংয়ে, জনসভায়, গাড়ি পার্কিং, হাট বাজার স্থাপন এমনকি ফসল শুকানোর স্থান (গ্রামে) হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি। এছাড়া কারণে অকারণে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ, পরিবহন ধর্মঘট আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আমাদের পরিবহন ব্যবস্থায় যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ. প্রযুক্তি: উন্নত প্রযুক্তি একটি দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। পরিবহনে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছি। যদিও বিদেশি সহায়তায় ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা অনেক এগিয়েছি (উড়াল সড়ক, মেট্রো রেল নির্মাণ) কিন্তু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও যথেষ্ট নয়। ফলে যাতায়াতে একদিকে যেমন সময় বেশি লাগছে, অন্যদিকে তা আরামদায়ক হচ্ছে না।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

ঙ.রাজনীতি: বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় রাজনীতি অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক। এদেশের রাজনীতিবিদরা ভোট পাওয়ার আশায় এমন অনেক জায়গায় রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করেন, যেখানে সেগুলো নির্মাণের প্রয়োজন নেই। এর ফলে অনেক অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট, স্টেশন বা বন্দর তৈরি হয়, যা আর্থিকভাবে লাভজনক তো নয়ই বরং অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

চ. বিদেশি সাহায্য: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী নয়। তাই রাস্তা-ঘাট, বিমানবন্দর, ব্রীজ প্রভৃতি নির্মাণের বড় কোন প্রকল্প গ্রহণের সময় বিদেশি সাহায্য নিতে হয়। অর্থাৎ, কীভাবে নির্মাণ করতে হবে, তার ডিজাইন কী হবে, কোন দেশ থেকে প্রকৌশলী নিতে হবে, নির্মাণ সামগ্রী কোন দেশের হবে প্রভৃতি সবকিছুই দাতা দেশ সমূহের ইচ্ছামাফিক হতে হয়। ফলে একদিকে কাজের গতি হ্রাস পায়, আবার অন্য দিকে আমাদের চাহিদামতো কাজ হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

সড়ক যোগাযোগ

বাংলাদেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য সড়ক অবকাঠামো তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনায় দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার সড়কপথ আছে। মোট সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৯৯১ কিলোমিটার (১৮%), আন্যলিক মহাসড়ক ৪,৮৯৮ কিলোমিটার (২২%) এবং বিভিন্ন প্রকারের জেলা সড়ক ১৩,৫৮৭ কিলোমিটার (৬০%)। এছাড়া, সওজ-এর আওতায় সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমানে ৪৭টি ফেরিঘাট দিয়ে ১৪৮টি বিভিন্ন ধরনের ফেরি এবং ১৪০ টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে (সূত্র- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)। উল্লেখ্য বিগত ২০১৫-২০১৮ পর্যন্ত চার বছরে সওজের অধীন সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যে কোনো পরিবর্তন না আসলেও বর্তমানে তা ক্রমবর্ধনমান হারে বেড়ে চলেছে (সারণি ৭.১)। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকার ৬টি সড়ক ও সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যথা-

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

ক. বেসরকারি ব্যবস্থাপনার অধীনে গৃহীত প্রকল্প-
-ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে (expressway) নির্মাণ।
-মদনপুর-ভুল্লা-দেবগ্রাম-জয়দেবপুর ৪ লেনবিশিষ্ট ঢাকা বাইপাস (by pass) তৈরি।
-হাতিরঝিল-বনশ্রী-রামপুরা আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ সড়ক সংযোগ এবং
-শেখের টেক-আমুলিয়া-ডেমরা রাজপথ (চিটাগং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়ক) নির্মাণ।
খ. সড়ক ও জনপথ অধীদপ্তরের অধীনে গৃহীত প্রকল্প-
গাবতলী-নবীনগর রাজপথ (highway) কে এক্সপ্রেসওয়ে (expressway) তে উন্নীতকরণ।
ঢাকা সার্কুলার রোড: ২য় পর্যায়: ৪ লেনবিশিষ্ট রাজপথ তৈরি (আব্দুল্লাহপুর-ধৌড়-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-ফতুল্লা-চাষাড়া-সাইনবোর্ড)।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথের বিবরণ সারণি ৭.১-এ দেয়া হলো।

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৩৩	১৩৫৯২	২২৪১৯
২০২২	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৪৫	২২৪৩৪
২০২৩	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬
২০২৪	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬

উৎস: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; ২০২৪।

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত পরিবহন অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষে ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি-দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৭৩,৫১৪ কি.মি. (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ৩,৪০,৩১২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। নিচে এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ৭.২ এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশের সড়ক ব্যবস্থা

কার্যক্রম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*	মোট
পাকা রাস্তা নির্মাণ/পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন (কি.মি.)	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	৪৪৫০	৪৬২০	৩৫৪৮	৭৩৮৬২
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি.)	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	২০০০০	২০৫০০	১৫৭৫১	৩৩১৮১০
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাথ নির্মাণ (কি.মি.)	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	১৫৬০	৬২০	৩৮০	১৪০১৯
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি.)	৩৬১৫	২৫৩৮	২৫৩৮	১৮০৪	১২২৭	১০৫০	২১৪২১

উৎস:* এলজিইডি, মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৫ সড়কপথ

সড়কপথ

This Topic is important for

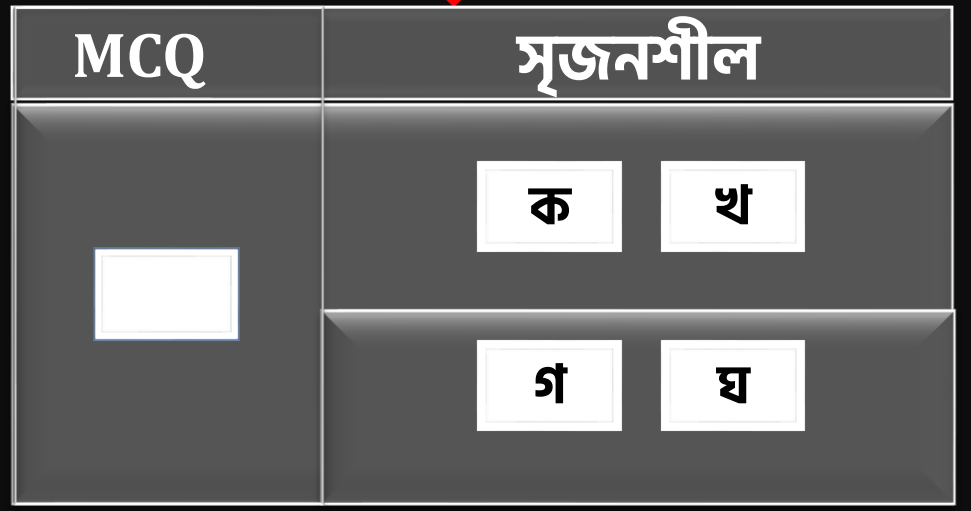

সড়কপথ

বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের প্রধানতম অবলম্বন হচ্ছে সড়কপথ। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এদেশে সড়কপথের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ অনেক নতুন ও প্রশস্ত রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মিত হওয়ার ফলে এবং রাস্তাঘাটে অনেক উন্নত মানের আরামদায়ক গাড়ি আসার ফলে মানুষ যেকোনো স্থানে যাতায়াতের জন্য সড়ক পথকে সর্বাগ্রে বেছে নিচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে রাজধানী ঢাকার সাথে সকল জেলা শহর তো বটেই এমনকি অধিকাংশ উপজেলা সদরও সরাসরি সড়কপথ দ্বারা সংযুক্ত। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান সড়ক পথের বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক: এই সড়কপথটি রাজধানী ঢাকাকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী ও দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত করেছে। এটি দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম জনপথ। প্রায় ২৭৮ কি.মি দীর্ঘ এই সড়কপথটি ঢাকা হতে কুমিল্লা ও ফেনী জেলার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছেছে। চট্টগ্রাম হতে এই সড়কের একটি শাখা কক্সবাজার, বান্দরবান, এবং অন্য শাখাটি কাপ্তাই হয়ে রাঙ্গামাটি গিয়ে শেষ হয়েছে।

সড়কপথ

খ. ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক: রাজধানী ঢাকা থেকে এই সড়কপথটি মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট হয়ে ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর জেলার উপর দিয়ে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী খুলনায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক পথটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪৬ কি.মি। পথিমধ্যে এই মহাসড়কের একটি শাখা ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ার দিকে এবং অন্য একটি শাখা যশোর থেকে সাতক্ষীরার দিকে গিয়েছে।

গ. ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক: দেশের নবীনতম এই মহাসড়কটি রাজধানী থেকে নরসিংদী, ভৈরব, আশুগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার মধ্য দিয়ে সিলেট গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রায় ৩০০ কি.মি দীর্ঘ এই সড়কপথে ভৈরবে মেঘনা নদীর উপর একটি অত্যাধুনিক দৃষ্টিনন্দন সেতু আছে।

সড়কপথ

ঘ. ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক: বিভাগীয় শহর রাজশাহীর সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ স্থাপনকারী এই সড়ক পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ কি.মি.। রাজধানী ঢাকা থেকে নবীনগর, কালিয়াকৈর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও নাটোর জেলার মধ্য দিয়ে এই মহাসড়কটি রাজশাহী গিয়ে পৌঁছেছে। রাজশাহী থেকে একটি শাখা সড়ক চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছে।

৬. ঢাকা-রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক: বাংলাদেশের এটি দীর্ঘতম মহাসড়ক। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর হয়ে দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ কি.মি.। বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়কসেতু, "যমুনা বহুমুখী সেতু" এই মহাসড়কের টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর উপরে অবস্থিত। এই মহাসড়ক থেকে কয়েকটি শাখা সড়ক পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা শহরে গিয়ে পৌঁছেছে।

সড়কপথ

চ. ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ফেরিঘাট হয়ে ফরিদপুর ও মাদারীপুর জেলার মধ্য দিয়ে বরিশাল পর্যন্ত দীর্ঘ এই মহাসড়ক দেশের অন্যতম আধুনিক সড়কপথ। প্রায় ২০৫ কি.মি. দীর্ঘ এই সড়কপথে অবস্থিত 'মাওয়া' নামক স্থানে পদ্মা নদীর উপর বহুল আলোচিত পদ্মাসেতু চালু হয়েছে। এ সেতু বরিশালসহ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিক সহজ এবং দ্রুত করে।

ছ. ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক: দেশের অন্যতম ব্যস্ত এই মহাসড়কটি ঢাকা থেকে উত্তরে টঙ্গী, জয়দেবপুর হয়ে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গিয়েছে। প্রায় ১৯০ কি.মি. দীর্ঘ এই মহাসড়কের দুই পাশে অনেক কারখানা স্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত ব্যস্ত এই মহাসড়কের গুরুত্ব অনুধাবন করে এটিকে চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

সড়কপথ

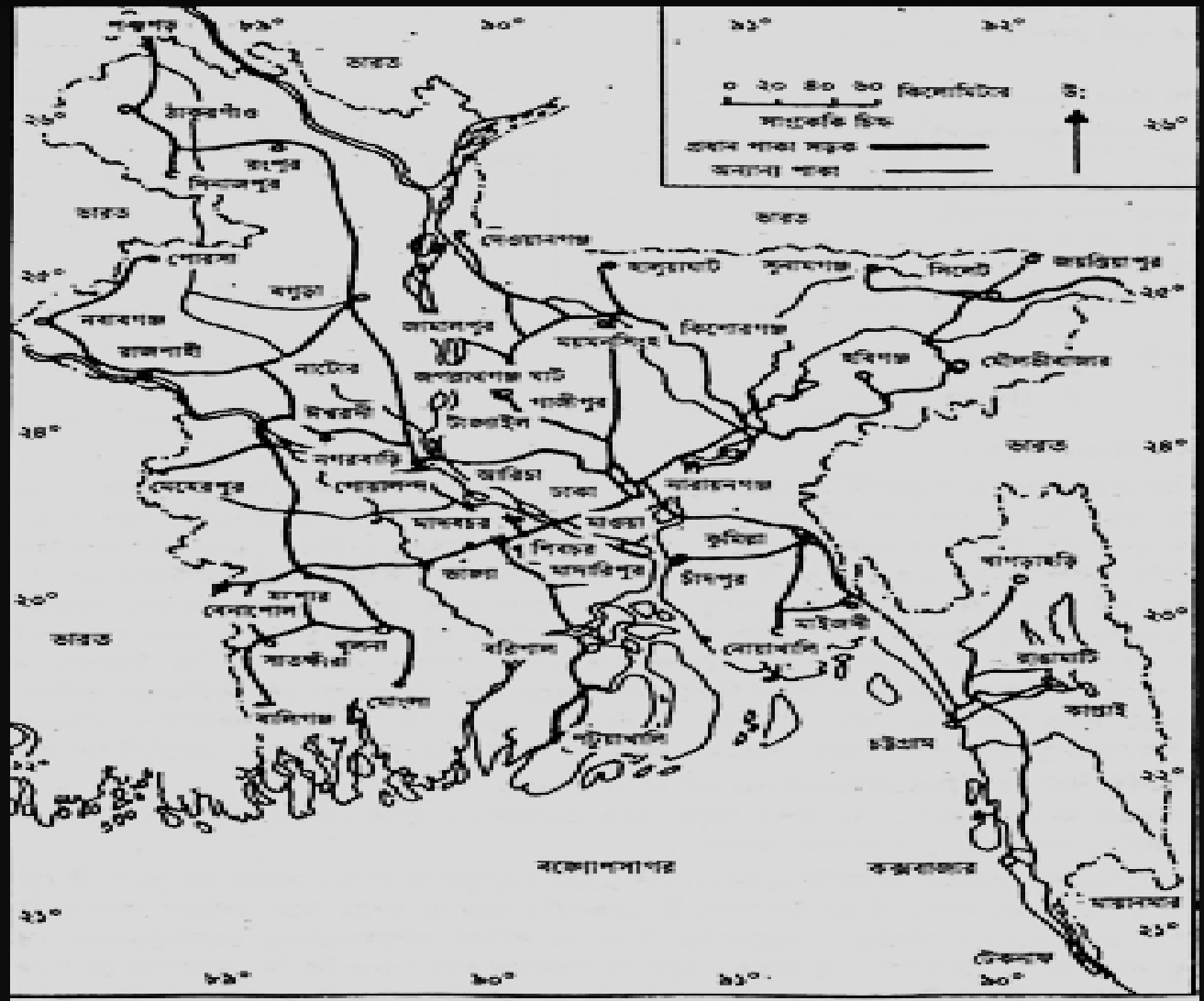

মানচিত্র-৭.১ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সড়কপথ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৬ রেলপথ

রেলপথ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রেলপথ

বিশ্বব্যাপী যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে রেলপথ। তবে নানাবিধ কারণে (যেমন- দেশের সর্বত্র রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠে নি) বাংলাদেশে পরিবহন ব্যবস্থায় রেলপথ নির্ভরশীলতার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি। এদেশে রেলপথ খুব বেশি বিস্তৃত না হলেও এদেশে রেলের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। ১৮৬২ সালে বৃটিশ আমলে 'ইস্টার্ণ বেজাল রেলওয়ে'র ব্যবস্থাপনায় ৫৩.১১ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে এই দেশ রেল যুগে প্রবেশ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ২,৭০৬ কি.মি রেলপথ নিয়ে সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান' রেলওয়ে গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যা 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' নামে বাংলাদেশের রেলপথ সংক্রান্ত সবকিছু দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব ও সুলভ গণযোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণের প্রত্যয়ে রেল যোগাযোগকে নির্ভরতার প্রতীক বানাতে সরকার ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ স্বতন্ত্র 'রেল মন্ত্রণালয়' সৃষ্টি করে। বর্তমানে ৩১০১ কি.মি. দীর্ঘ রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৪৮৯টি রেলস্টেশন রয়েছে।

রেলপথ

রেলপথের ধরন (Classification of Railway)

রেলের দুইটি পাতের মধ্যবর্তী ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের রেলপথকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ডুয়েলগেজ রেলপথ।

ক. ব্রডগেজ: রেলের দুটি পাতের মধ্যবর্তী ব্যবধান যদি ১.৬৮ (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) মিটার হয় তবে ঐ রেলপথকে ব্রডগেজ রেলপথ বলে। এই রেলপথের উপর চলাচলকারী রেলগাড়ি অনেক প্রশস্ত বলে চলাচল আরামদায়ক। যমুনা নদীর পশ্চিমাংশের জেলাগুলোতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে (রাজশাহী, পাবনা, যশোর, খুলনা) ব্রডগেজ রেলপথ চালু আছে। এদেশে বর্তমানে প্রায় ৮৮০ কি.মি. ব্রডগেজ রেলপথ চালু আছে। ব্রডগেজ রেলপথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেলজংশন ও রেলস্টেশনের মধ্যে খুলনা, যশোর, দর্শনা, পোড়াদহ, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, সান্তাহার, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি প্রধান।

রেলপথ

সাল	কিলোমিটার গমন পথ				ইঞ্জিন	গাড়ীর সংখ্যা		
	ব্রডগেজ	ডুয়েলগেজ	মিটারগেজ	মোট	ডিজেল	যাত্রী	অন্যান্য কোচ	ওয়াগন
২০১৮-১৯	৮৩২	৫৩৫	১৬৫২	৩০১৯	২৬৩	১৬০৫	১৫৯	৭০২৬
২০১৯-২০	৮৮০	৫৩৪	১৬৮০	৩০৯৩	২৬০	২২৯৯	৬৩	৭১৭৪
২০২০-২১	৮৭৯	৫৩৩	১৬৭৯	৩০৯১	২৬০	২৩৩০	৬৫	৭৩০৪
২০২১-২২	৮৮০	৫৪১	১৬৮০	৩১০১	২৯৩	২৩৫৭	৩৯	৫৮৮৩

রেলপথ

খ. মিটারগেজ: যে রেল লাইনের দুটি পাতের মধ্যবর্তী ব্যবধান থাকে ১ মিটার (১০০০ মি.মি.) সেই রেলপথকে মিটারগেজ রেলপথ বলে। যমুনা নদীর পূর্ব পাশের অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের (কুমিল্লা, সিলেট) জেলাগুলোতে মিটারগেজ রেলপথ বিদ্যমান। বাংলাদেশে মিটারগেজ রেলপথই সবচেয়ে বেশি এবং বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১,৬৮০ কি.মি মিটারগেজ রেলপথ আছে। মিটারগেজ রেলপথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেলস্টেশন ও রেলজংশনের মধ্যে ঢাকার কমলাপুর, ভৈরব, ময়মনসিংহ, টঙ্গী, আখাউড়া, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রধান।

গ . ডুয়েলগেজ: এটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি রেলপথ। পূর্বে যমুনা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক রেলপথ থাকায় সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের রেলগাড়ি চলাচল করত। এক রেলপথের গাড়ি অন্য রেলপথে চলাচলে অযোগ্য ছিল বিধায় দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ছিল না। ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরের সরাসরি রেল যোগাযোগ ছিল না। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মিত হওয়ায় দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে রেল যোগাযোগের প্রধান বাধা অপসারিত হয়। পরবর্তীতে দুই ধরনের রেলপথের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ব্রড ও মিটারগেজ রেলপথে দুই পাতের সাথে তৃতীয় একটি পাত যোগ করে ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এর ফলে এই ধরনের রেলপথে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ উভয় ধরনের রেলগাড়ি চলাচল করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫৪১ কি.মি ডুয়েলগেজ রেলপথ আছে এবং এই রেলপথ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে।

রেলপথ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রেলপথসমূহ (Major Railways in Bangladesh)

(ক) ঢাকা → টঙ্গী → ভৈরব → আখাউড়া → কুমিল্লা → লাকসাম → ফেনী → চট্টগ্রাম

(খ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → ময়মনসিংহ

(গ) ঢাকা → টঙ্গী → ভৈরব → আখাউড়া → মৌলভীবাজার সিলেট

(ঘ) ঢাকা → টঙ্গী → ভৈরব → কিশোরগঞ্জ

(ঙ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → নেত্রকোনা

(চ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → সিরাজগঞ্জ

(ছ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → সান্তাহার → রংপুর → লালমনিরহাট

(জ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → সান্তাহার → সৈয়দপুর → দিনাজপুর

(ঝ) ঢাকা → টঙ্গী → জয়দেবপুর → ঈশ্বরদী → পোড়াদহ → দর্শনা → যশোর → খুলনা

(ঞ) ঢাকা → নারায়ণগঞ্জ

(ট) চট্টগ্রাম → লাকসাম → আখাউড়া → সিলেট

(ঠ) খুলনা → যশোর → ঈশ্বরদী → রাজশাহী

(ড) খুলনা → যশোর → ঈশ্বরদী → পার্বতীপুর → সৈয়দপুর

(ঢ) খুলনা → দর্শনা → পোড়াদহ → কুষ্টিয়া → রাজবাড়ী → দৌলতদিয়া

(ণ) চট্টগ্রাম লাকসাম চাঁদপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৭ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

পৃথিবীর সকল দেশে রেলপথ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম বলে বিবেচিত এবং এটি অত্যন্ত লাভজনকও বটে। কিন্তু আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রেল নিয়ে সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অভাব, মান্ধাতার আমলের ইঞ্জিন ও কোচ এবং রেলের সাথে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর সীমাহীন লুটপাট বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রেলওয়ে থেকে লাভ দূরে থাক প্রতিবছর অনেক ভর্তুকি দিতে হয় সরকারকে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

পৃথিবীর সকল দেশে রেলপথ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম বলে বিবেচিত এবং এটি অত্যন্ত লাভজনকও বটে। কিন্তু আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রেল নিয়ে সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অভাব, মান্ধাতার আমলের ইঞ্জিন ও কোচ এবং রেলের সাথে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর সীমাহীন লুটপাট বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রেলওয়ে থেকে লাভ দূরে থাক প্রতিবছর অনেক ভর্তুকি দিতে হয় সরকারকে।

সাল	যাত্রী পরিবহণ কি.মি. হিসাবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কি.মি. হিসাবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০১৬-১৭	১০০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	৯৩০.৩৭	২২২৯.২২
২০১৭-১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১০	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯	১৪৩৩৪.৭৬	১০৭৫.১৪	১১২৬.০৫	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০	৯৫৭	১০০২	১১২	৩১৮৯
২০২০-২১	১০৪৫৬	১০৪২	১১৮২	৩২৮৪
২০২১-২২	৬১৮৯	১১০৩	১২৭৯	২৩৯৩

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা (Problems in Bangladesh Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে এটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা সমূহ নিম্নরূপ:

ক. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব: এটি রেলখাতে বিদ্যমান প্রধানতম সমস্যা। রেলের সাথে সংশ্লিষ্টদের সুষ্ঠু ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অভাবে এদেশের রেলব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলে রয়ে গেছে।

খ. ব্যবস্থাপনার অভাব: রেলওয়ের অন্যতম সমস্যা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব। বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত অদক্ষ। অপেশাদার বা আধাপেশাদার কর্মীদের দ্বারা রেলওয়ে পরিচালিত হচ্ছে। রেলওয়েতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করা এসব কর্মীদের সাধ্যের বাইরে। এই সমস্যা দিন দিন অধিক প্রকট হচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

গ. মান্ধাতা আমলের রেল ট্র্যাক: বাংলাদেশের অধিকাংশ রেল ট্র্যাক বৃটিশ আমলে স্থাপিত। এরপর থেকে সেই সমস্ত ট্র্যাকগুলো খুব বেশি সংস্কার করা হয়নি। ৪০ বছরের মধ্যে রেল ট্র্যাক তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেললেও বাংলাদেশে ৭০-৮০ বছরের পুরাতন রেল ট্র্যাক দিয়ে কাজ চলছে। এই সমস্ত রেলপথে দ্রুত গতিতে রেলগাড়ি চালানো সম্ভব হয় না।

ঘ. স্লিপার ও পাথরের অভাব: রেলের গতি ঠিক রাখা, দুর্ঘটনা এড়ানো এবং রেললাইনকে অধিক মজবুত করার জন্য লাইনের নিচে পর্যাপ্ত স্লিপার ও পাথর বসাতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এদেশের অনেক জায়গায় রেল লাইনের নিচে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্লিপার নেই। এমনকি কোথাও কোথাও পাথরও নেই। যথেষ্ট পরিমাণ স্লিপার ও পাথরের অভাবে রেল দুর্ঘটনার আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

ঙ. ইঞ্জিন ও বগির অভাব: সারাদেশে রেল ব্যবস্থা নিয়মিত রাখতে গেলে যে পরিমাণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ ইঞ্জিন ও বগি নেই। ফলে একই ইঞ্জিন ও বগি একাধিক রুটে ব্যবহৃত হয়। এতে একদিকে যেমন ইঞ্জিনের উপর চাপ পড়ে অপরদিকে বিভিন্ন রুটে সময়সূচি মেনে চলা সম্ভব হয় না।

চ. ত্রুটিপূর্ণ সংকেত পদ্ধতি: বাংলাদেশ রেলওয়ের সংকেত পদ্ধতি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বয়ংক্রিয় নয়। অবৈজ্ঞানিক ও অনাধুনিক এই সংকেত পদ্ধতির কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

ছ. সুযোগ-সুবিধার অভাব: বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রেলযাত্রীদের তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে না। রেল গাড়ির অভ্যন্তরে ভাঙ্গা ও নোংরা সিট, নোংরা বাথরুম, ভাঙ্গা লাইট, অচল ফ্যান, স্টেশনে বিশ্রামাগারের অভাব ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুম, যাত্রীদের যাত্রাকে অসহনীয় করে তোলে। দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্য ট্রেনে খাবারেরও তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকে না।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

জ.ডাকাতি ও চুরি: পর্যাপ্ত রেলপুলিশ ও নজরদারির অভাব এবং কর্তব্যে অবহেলার কারণে রেলগাড়ি, রেললাইন এবং রেল ওয়ার্কসপ থেকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি, তেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, স্লিপার ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি রেলওয়ের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

ঝ. বিনা টিকিটে ভ্রমণ: আমাদের একটি অত্যন্ত বাজে অভ্যাস হচ্ছে আমরা ট্রেনে ভ্রমণের সময় টিকিট কাটতে চাই না অথবা এক স্টেশনের টিকিট কেটে পরবর্তী কোনো স্টেশনে নামি। দিন দিন মানুষের এই অনৈতিক অভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থায় অনেকেই এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করে না। মানুষের এই নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে রেলের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ কাঙ্খিত মানে পৌঁছাচ্ছে না।

ঞ. আর্থিক সমস্যা: বাংলাদেশ একটি উন্নয়শীল দেশ। রেলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ আর্থিক বরাদ্দ দেওয়ার কথা তা দেওয়া সম্ভব হয় না। অর্থের অভাবে নতুন রেলপথ নির্মাণ, নতুন ইঞ্জিন ও বগি ক্রয়সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

রেলপথে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উপায়
(Ways to Overcome the Problems of Railway)

বাংলাদেশের রেলপথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক. সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন; যেকোনো কাজ সফলভাবে করার পূর্বে প্রয়োজন একটি যথাযথ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রেলের লাইন সংস্কার নতুন ইঞ্জিন ও বগি ক্রয়সহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

খ. দক্ষকর্মী নিয়োগ: রেল পরিচালনায় দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে অথবা নিয়োজিত কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে তুলতে হবে। এর ফলে রেলের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উত্তম হবে।

গ. প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ: রেলের নতুন ইঞ্জিন ও বগি ক্রয়, লাইন সংস্কার, স্টেশন মেরামত, আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রভৃতি কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে অর্থ যেন অপব্যবহার না হয়ে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. ডাকাতি ও চুরি রোধ: রেলে ডাকাতি ও চুরি হলে রেলের নিজস্ব আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি যাত্রীর সংখ্যাও হ্রাস পায়। এজন্য ট্রেনে চুরি ও ডাকাতি রোধে প্রয়োজনীয় রেলপুলিশ নিয়োগ এবং অপরাধীদের সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান

ঙ. বিনা টিকিটে ভ্রমণ রোধ: যাত্রীদের টিকিট কাটা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ রেলের আয়ের উৎস। আর সেই যাত্রীরা যদি টিকিট না কেটে রেল ভ্রমণ করে তবে রেলের আয় বৃদ্ধি পাবে না। রেল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই আমাদের সবাইকে সঠিক মূল্যের টিকিট কেটে রেলে ভ্রমণ করতে হবে।

চ. যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ: রেলের যন্ত্রপাতি যেন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। এই কাজে দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে। তাহলে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ছ. আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ: রেলে আধুনিক ব্যবস্থা, লাইট, ফ্যান, সিগন্যাল বাতি, এসি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে মানুষ রেলে ভ্রমণে আরাম পাবে এবং রেলের প্রতি আস্থা ফিরে পাবে। আর যাত্রী বেশি হলে আয় বেশি হবে।

উপরের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার ক্ষতির মাত্রা কাটিয়ে উঠে লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

সুপ্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সড়কপথ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রথম অবস্থায় গরু, ঘোড়া, মহিষ বাহন হিসেবে সড়কপথে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে চাকার গাড়ি (গরু, ঘোড়া, উট চালিত) আবিষ্কৃত হওয়ায় সড়কপথ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমানে মোটর চালিত গাড়ি ও ট্রাক সড়কপথের প্রধান যানবাহন। বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

সড়ক পরিবহনের সমস্যা বা অনগ্রসরতার কারণ
(Causes of Problems in Road Transport)

নিম্নে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা বা অনগ্রসরতার কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১. নদ-নদীর অবস্থান: নদীমাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাঁওড় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলোর উপর দিয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা কঠিন কাজ এবং ব্যয়বহুল। তাই নদ-নদীর অবস্থান সড়ক পরিবহনের অন্তরায়।

২. নিচু ভূমি: বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিচু হওয়ায় বর্ষার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। এসব নিচু জমিতে উঁচু বাঁধ দেওয়া বা রাস্তা নির্মাণ করা আমাদের উন্নয়নশীল দেশের জন্য ব্যয়সাপেক্ষ।

৩. মৃত্তিকার বিশেষত্ব: বাংলাদেশের মাটি বেলে ও দোআঁশ-তথা নরম প্রকৃতির। মাটি 'নরম প্রকৃতির হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার সময় এদেশের সড়ক পথের প্রচুর ক্ষতি হয়। তাছাড়া নরম মাটির কারণে প্রতি বছর পুল বা কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং মৃত্তিকার বিশেষত্ব বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায়।

৪. জলবায়ুর প্রভাব: বাংলাদেশে মৌসুমি জলবায়ু বিরাজমান। গ্রীষ্মকালে প্রচুর তাপমাত্রা বিরাজ করে। এ উচ্চ তাপমাত্রার জন্য এদেশের সড়কপথের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে পাকা সড়কের অধিকাংশই ইট ও পিচ দ্বারা নির্মিত। ফলে অধিক গরমের সময় পিচ গলে যায় এবং ঐ রাস্তার উপর দিয়ে পণ্য পরিবাহিত গাড়ি চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

৫. মূলধনের অভাব: প্রতিবছর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোটি কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ টাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ফলে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ব্যাহত হয়।

৬. বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা ও স্বল্পতা: বাংলাদেশের সড়কপথ নির্মাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তার অধিকাংশই আসে দাতা দেশ থেকে। তবে এতে অনেক শর্ত থাকে। শর্ত পূরণ করা না হলে সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সড়ক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয় যা সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অন্তরায়।

৭. নির্মাণসামগ্রীর অভাব: পাকা সড়ক নির্মাণের জন্য কঠিন পাথর, ইট, সিমেন্ট, পিচ, রড ইত্যাদি প্রয়োজন। এগুলো ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং নির্মাণ কাজের প্রয়োজনীয় কার্পেটার রোলার, মিলিং মেশিন ইত্যাদির অভাব থাকায় সড়ক পথের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এতে করে পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা হয়।

৮. যানবাহনের অভাব: বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনের অনগ্রসরতার আরেকটি কারণ হলো পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব। বাস, ট্রাক, কার প্রভৃতি যানবাহনের অভাবে পরিবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা সংঘটিত হয়, যা সড়কপথ ও সেতুর বেশ ক্ষতিসাধন করে। ফলে প্রতিবছরই সড়কপথ মেরামতের প্রয়োজন হয়। এর ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান

১০. সড়ক দুর্ঘটনা: বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার বেশি। অদক্ষ ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভারদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো, যান্ত্রিক ত্রুটি, ট্রাফিক আইন মেনে না চলা, রাস্তার কাঠামোগত সমস্যা, ফুটপাত দখল, যানজটে সময় নষ্ট হওয়া প্রভৃতি অবস্থা এদেশে পরিলক্ষিত হয়। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা বেশি ঘটে। সুতরাং সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা।

১১. দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারী: দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টাকার বিনিময়ে পুরনো গাড়ি রাস্তায় চলার অনুমতি দেয় যা মারাত্মক বায়ুদূষণ ঘটায় এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মূল্যবান জীবন ধ্বংস হয়। আবার আটককৃত গাড়ি টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১২. শ্রমিক-মালিক সমিতির প্রভাব: বাংলাদেশের পরিবহন সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকরা প্রায়ই তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য পরিবহন ধর্মঘট আহ্বান করে। এতে যাত্রীদের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে সমস্যা দেখা দেয়।

১৩. চাঁদা আদায়: বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। ট্রাফিক পুলিশ ও বড় বড় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় টোকেনের মাধ্যমে চাঁদাবাজরা সড়ক পথে বাস, ট্রাক থামিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে।

৫. আইন প্রয়োগ: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আরো কঠোর হতে হবে যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ পুরানো গাড়ি রাস্তায় চলতে না পারে। তাছাড়া অদক্ষ ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন কোনো লোক গাড়ি চালালে কিংবা ট্রাফিকআইন ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মূলধন যোগানো: সড়কপথ নির্মাণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় কী-না সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে সড়ক নির্মাণে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. ঋণ গ্রহণ; মজবুত, স্থায়ী এবং প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করার জন্য ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুততার সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

৮. উপকরণ সরবরাহ: প্রশস্ত ও মজবুত সড়ক নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ইট, পাথর, সিমেন্ট, বালি, পিচ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

৯. উন্নতমানের যানবাহন আমদানি: বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন সমস্যা সমাধান করতে হলে পুরনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির পরিবর্তে নতুন গাড়ি আমদানি করতে হবে।

১০. সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি বন্ধ: দক্ষ কোম্পানীকে দিয়ে নিবিড় দুর্নীতিমুক্ত তত্ত্বাবধানে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার প্রয়োজন, যাতে নির্মিত সড়কে খানা-খন্দক তৈরি না হয় ও সড়ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উল্লেখিত উপায়সমূহের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরিবহন ব্যবস্থাই একটি দেশকে অন্যান্য দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনের সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সার্বিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধানতম মাধ্যম হলো সড়কপথ। এদেশে রেল পরিবহন ব্যবস্থা দেশের সকল এলাকায় সম্প্রসারিত করা যায়নি। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের নদীসমূহকে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিণত করতে পারিনি। তাই সড়কপথ আমাদের প্রধান ভরসা। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ১ মিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য প্রায় ১৭০ কি.মি. রাস্তা আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এদেশের যেকোনো জায়গা থেকে গড়ে ৫ কি.মি. এর মধ্যে কোনো না কোনো রাস্তা আছে। দেশের অর্থনীতিতে তাই সড়কপথের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

ক. কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ৭৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। আর কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। কৃষিকাজের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক, বীজ এবং উৎপাদিত পচনশীল পণ্য জরুরিভিত্তিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের জন্য সড়ক পথ অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

খ. উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনো কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। অঞ্চলভেদে কৃষিপণ্যের ধরন ও পরিমাণে তারতম্য হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য যদি যথাসময়ে বাজারজাত করা না যায় তাহলে একদিকে যেমন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরদিকে দেশের সর্বত্র পণ্যের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয় না। আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়কপথের সুবিধা থাকায় কৃষি পণ্য পরিবহণে সড়কপথ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

গ. শিল্প উন্নয়নে সড়কপথ: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্প উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিল্পকারখানায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত পণ্য দেশের সর্বত্র পরিবহনের জন্য উত্তম পরিবহন থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সকল শিল্পাঞ্চল উত্তম সড়ক পরিবহন দ্বারা সংযুক্ত। তাই শিল্প উন্নয়নে সড়কপথ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

ঘ. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়কপথ: দেশের সর্বত্র সমানভাবে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে উন্নয়নও সুষমভাবে হয়। পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র সড়কপথ গড়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়কপথের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ঙ. শিল্পপণ্যের বাজারজাতকরণ: কারখানায় উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চ. কর্মসংস্থান: সড়কপথসমূহ এদেশের অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস। সড়কপথকেন্দ্রিক বিভিন্ন যানবাহন পরিচালনা, যাত্রী ও মালামাল পরিবহন, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে অসংখ্য লোক নিয়োজিত। এই অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্ভর করে বাংলাদেশের সড়কপথের উপর।

ছ. বনজ সম্পদের পরিবহনে সড়কপথ: প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে বনজ সম্পদের পরিমাণ অনেক কম। স্বল্পপরিমাণে হলেও এই সমস্ত বনজ সম্পদ সিলেট, খুলনা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এই সকল বনভূমিতে কাঠসহ অন্যান্য মূল্যবান যে বনজ সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এবং দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

জ. গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ: বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক গ্রামসমূহে বাস করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির গ্রাম ও শিল্প/বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির শহরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে সড়কপথসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষিপণ্য শহরে আনার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, দাপ্তরিক কাজ প্রভৃতি নানাবিধ কাজে গ্রামের মানুষ শহরে আসে। আবার উৎপাদিত শিল্পপণ্য শহর থেকে গ্রামে পৌছাতে সড়কপথই প্রধান ভরসা।

ঝ. আমদানি দ্রব্যের সুষম বণ্টন: বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এই সমস্ত পণ্য দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ঞ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্ব: দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও গতিশীল রাখার জন্য সড়কপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ট. সামাজিক সুবিধা: সড়কপথ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ প্রভৃতির বিনিময় ঘটাতে সাহায্য করে। এর ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ সড়কপথ আমাদেরকে সামাজিক হতে সাহায্য করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ১০ বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা এদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। ভূতাত্ত্বিক গঠনগত দিক দিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশ উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু এবং নদ-নদীগুলো সেভাবেই প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সাত শতাধিক নদ-নদী ছাড়াও দেশের দক্ষিণে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। সাগর ও নদীর অপূর্ব মেলবন্ধনের কারণে বাংলাদেশে একদিকে যেমন ব্যস্ত সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে অপরদিকে এদেশের নদীগুলোর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নদী বন্দর। বর্তমানে এদেশে তিনটি সমুদ্র বন্দর ছাড়াও ৩৯টি নদী বন্দর বিদ্যমান আছে। বর্তমানে আরো ৬টি নদীবন্দর চালুর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ-

ক. অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ: বাংলাদেশে নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার প্রধান অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে প্রাকৃতিক। এদেশে সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠার জন্য অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, পশ্চাৎভূমি, সমুদ্র তলদেশের ভূপ্রকৃতি, ভূতাত্ত্বিক গঠন, নদ-নদীর সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ ধনাত্মক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। নিচে এই সমস্ত অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:-

১. ভৌগোলিক অবস্থান: এদেশে নদী ও সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক জুড়ে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও সমগ্র দক্ষিণ দিক জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ফলে এদেশে একাধিক সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠার চমৎকার প্রাকৃতিক সুযোগ রয়েছে।

২. পশ্চাৎভূমি: বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তরে নেপালের কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয় পর্বত, পূর্বে ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি প্রদেশ নিয়ে সুবিস্তৃত পশ্চাৎভূমির অবস্থান হওয়ায় এদেশে সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে। উল্লিখিত দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা হলে তারা আমাদের বন্দর ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমুদ্র বন্দরের ব্যাপ্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

যেকোনো দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য প্রয়োজন বন্দরের উন্নতি। এ উন্নতি নির্ভর করে পশ্চাৎভূমির উপর। বন্দরের উন্নতি পশ্চাৎভূমির আয়তন, জনবসতির ঘনত্ব এবং যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের নৌ ও সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ

পশ্চাৎভূমির আয়তন: পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে পশ্চাৎভূমির আয়তনের উপর। কারণ বেশি আয়তনের পশ্চাৎভূমিতে পণ্যদ্রব্যও অধিক উৎপন্ন হয়। যা বন্দরের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

পশ্চাৎভূমির বসতি: বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর দুটির ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। কারণ ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা মিটাতে প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

পশ্চাৎভূমির যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা: বন্দরে উন্নতি নির্ভর করে পশ্চাৎভূমির উন্নত পরিবহন ওযোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। পশ্চাৎভূমির উন্নত যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চাৎভূমির উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল সহজেই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি ও আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য সহজেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বহন করা যায়।

৩. বিস্তৃত মহীসোপান: বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ এমন যে, এখানে সুবিস্তৃত মহীসোপান অঞ্চল রয়েছে যা বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক। অনুকূল অবস্থার কারণে এদেশে একাধিক সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. ভূতাত্ত্বিক কারণ: ভূতাত্ত্বিক গঠনগত কারণে বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। একই কারণে বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদী সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়েছে। এই সমস্ত নদীর তীরে নৌবন্দর গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে নদীবন্দর গড়ে ওঠার জন্যও চমৎকার ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান। নদীমাতৃক এ দেশে অসংখ্য নদী জালের মতো গোটা বাংলাদেশকে জড়িয়ে আছে। দেশে বর্তমানে প্রায় সাত শতাধিক নদী রয়েছে। নদ-নদীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এদেশে স্বাভাবিকভাবেই অনেক নৌবন্দর গড়ে উঠেছে। আমরা যদি আমাদের নদ নদী সমূহকে অধিক পরিকল্পিত ও সচেতনভাবে ব্যবহার করতে পারতাম তবে এদেশে অনেক নদী নাব্যতা হারাত না এবং আমাদের দেশে আরো অধিক নৌবন্দর গড়ে উঠতে পারত।

খ. সামাজিক পরিবেশ/অপ্রাকৃতিক পরিবেশ: বাংলাদেশে সমুদ্র ও নৌ বন্দর গড়ে ওঠার জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি সামাজিক বা অপ্রাকৃতিক পরিবেশও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান, বাণিজ্য প্রভৃতি নৌ ও সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। নিম্নে কতিপয় সামাজিক/অপ্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. অর্থনৈতিক: অন্য যে কোনো পরিবহন মাধ্যম অপেক্ষা নদীপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন অর্থনৈতিভাবে লাভজনক। এই কারণে সুযোগ থাকলে এদেশের মানুষ নৌপথে ভ্রমণে অধিক আগ্রহী হয়। লোকজনের আগ্রহের কারণে এদেশে অধিক নৌ বন্দর গড়ে উঠেছে।

২. আরামদায়ক: জলপথে ভ্রমণ শুধু আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক নয় বরং এটি অনেক আরামদায়ক। এ কারণে সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ নৌপথে ভ্রমণে আগ্রহী। মানুষের আরামপ্রিয়তার কারণে প্রয়োজনের তাগিদেই এদেশে অনেক নদী বন্দর গড়ে উঠেছে।

৩. নিরাপদ: বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, হরতাল, গোলোযোগ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে সড়ক, রেল বা বিমানপথে যাতায়াত বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু জলপথ এদিক থেকে অনেক নিরাপদ। এটি সহজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। এজন্য নদীপথের ব্যবহার অনেক বেশি। সঙ্গত কারণেই এদেশে অনেক নদী বন্দর গড়ে উঠেছে।

৪. ভূরাজনৈতিক অবস্থান: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ থেকে সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল, ভূটান, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ এমনকি চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করা যায়। বিশেষ করে নেপাল ও ভূটানের কোনো সমুদ্র বন্দর না থাকায় উক্ত দেশসমূহের সমুদয় বাণিজ্যের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যায়। এই দিকগুলো মাথায় রেখে বাংলাদেশে বিদ্যমান সমুদ্র বন্দর দুটির আধুনিকায়নসহ নতুন সমুদ্র বন্দর তৈরির যৌক্তিকতা রয়েছে।

৫. কর্মসংস্থান: বাংলাদেশে নদী ও সমুদ্র বন্দরকে ঘিরে বন্দর কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-শ্রমিক, নৌযান চালক, নৌযান মেরামতকারী, নৌযান প্রস্তুতকারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। এই সমস্ত পেশার মানুষের জীবিকা নির্বাহ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এদেশে নতুন নতুন নৌবন্দর সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৬. বাণিজ্য: বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে নৌ ও সমুদ্র বন্দরের প্রভাব অনেক বেশি। আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৭৫ ভাগ সমুদ্রপথে সংঘটিত হয়। আমাদের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দরের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার নৌপথে পণ্য পরিবহন অনেক সুলভ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সিংহভাগ পণ্য নৌপথে পরিবহন করা হয়ে থাকে। এ কারণে এদেশে সমুদ্র ও নদী বন্দরসমূহ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ১১ বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি সমুদ্রবন্দর রয়েছে। যথা- ১. চট্টগ্রাম, ২. মংলা ও ৩. পায়রা সমুদ্রবন্দর।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর (Chattogram Sea Port)

বাংলাদেশের প্রধান, সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর হলো চট্টগ্রাম বন্দর। প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় এ বন্দরের অন্যতম সুবিধা। একটি আদর্শ বন্দরের প্রধানম শর্তই আদর্শ পোতাশ্রয়, যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। এ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অধিকাংশ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের গুরুত্ব: চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর মোহনা হতে প্রায় ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। এ বন্দরের গুরুত্ব নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. এটি বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর।

২. শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়।

৩. দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯২ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে সুম্পাদিত হয়।

৫. এ বন্দরকে কেন্দ্র করে এখানে বহু শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেছে।

৬. দেশের খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্যে এ বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়।

৭. এ বন্দরের বিভিন্ন কাজে বহুলোক নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

৮. এ বন্দর না থাকলে বাংলাদেশ বহিঃবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হতো।

চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়:

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৮-২০১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০২০	২৯২৪.৯৯	১৭১৬.২৯	১২০৮.৭০
২০২০-২০২১	৩০৭০.৩৬	১৮৯২.৭৫	১১৭৭.৬১
২০২১-২০২২	৪০৭২.৫৫	১৯৬৬.৬০	২১০৫.৯৫
২০২২-২০২৩	৪৪৩৮.৯৩	২১৩৪.৮১	২৩০৪.১২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রায় ৯২% চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রেরণ করা হয়। এ বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে পাট ও পাটজাতদ্রব্য, তৈরি পোশাক, চা, চামড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকৃত প্রধান পণ্যসামগ্রী হলো খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম, কলকব্জা, নির্মাণ দ্রব্য ইত্যাদি। এটি বিশ্বের ৬৭তম ব্যস্ততম বন্দর (সূত্র- Lloyd's list-2023) মোট কথা বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য তথা অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

মোংলা সমুদ্রবন্দর (Mongla Sea Port)

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হলো মোংলা সমুদ্রবন্দর। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর। খুলনা শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীরে এ বন্দর অবস্থিত। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্দরটি জাহাজ চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

গড়ে উঠার কারণ:

১. দেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি;

২. উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পরিবহন কষ্টসাধ্য;

৩. চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ ও জেটি নির্মাণ খুব ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।

মংলা বন্দরের গুরুত্বঃ

১. এ বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্য সহজে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

২. এ বন্দরে বহুলোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

৩.এ বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় বলে কন্দরটি কৃষির উন্নতিতে সহায়ক।

৪. অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরের সাথে সংযোগ থাকায়, এ বন্দরে স্বল্প মূল্যে পণ্যদ্রব্য আনা এবং দেশজুড়ে (আমদানিকৃত) পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

৫. বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়ে থাকে।

৬. শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়ে থাকে।

৭. দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে এ বন্দর সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সারণি-৭.৬: রাজস্ব আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান (কোটি টাকায়)

সাল	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১৮-২০১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	১৩৩.০০
২০১৯-২০২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২০২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২০২২	৩১৭.০৮	২১৯.৯৯	৯৭.০৯
২০২২-২০২৩	৩০২.৪২	২৪৬.৪১	৫৬.০১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর

পায়রা সমুদ্রবন্দর (Payra Sea Port)

পায়রা বাংলাদেশে গড়ে ওঠা তৃতীয় সমুদ্রবন্দর। পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়ায় রাবনাবাদ চ্যানেলের তীরে বন্দরটি গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির অব্যাহত গতি এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষে ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে 'পায়রা সমুদ্রবন্দর আইন ২০১৩' পাস হয়। ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ সালে 'পায়রা সমুদ্রবন্দর' উদ্বোধন করা হয়। ১৯ আগস্ট ২০১৬ থেকে সমুদ্রবন্দরটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে পশ্চাদভূমি (দেশের অভ্যন্তরভাগ) থেকে বন্দর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রী (সিমেন্ট, সার) পরিবহনের কার্যক্রম সীমিতভাবে শুরু হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর রাজস্ব আয় ছিল ২১.৯৪ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২৪ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ২৭৮.৫৮ কোটি টাকা।

পায়রা সমুদ্রবন্দর গড়ে ওঠার কারণ:

১. দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রাণ সঞ্চার করা; বিশেষ করে পোশাক রপ্তানি সহজীকরণ করা;

২. স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি সুবিধা নিশ্চিত করা;

৩. গভীর সমুদ্রবন্দরের অভাব পূরণ করা।

৪. কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ১২ বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা
(Advantages of Bangladesh's River Transport)

১. কৃষির উন্নয়ন: সুলভ ও সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকার্যে উন্নতি হয় না। কৃষিক্ষেত্রে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া এবং উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সমভূমি অঞ্চলে (যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল) জলপথের সুবিধা থাকায় এখানে কৃষির উন্নয়ন সহজ হয়েছে।

২. শিল্পোন্নয়ন: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে (নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর) দ্রুত নানা প্রকারের শিল্প গড়ে উঠার মূলে রয়েছে নদীপথের অবদান। নদীপথে শিল্পের কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করা যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্যও অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা যায়। তাই দেশের শিল্পোন্নয়নও জলপথের ওপর নির্ভরশীল।

৩. স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ: অভ্যন্তরীণ জলপথ বাংলাদেশের স্বাভাবিক যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা। এ পথে পরিবহণ ও যাতায়াত খরচ খুবই কম। যেমন- ঢাকা থেকে চাঁদপুর জলপথে পরিবহনে খরচ সড়ক পথের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ কম।

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৪. ভারী পণ্য পরিবহণের সুবিধা: অন্য যেকোনো পরিবহণের তুলনায় জলপথে ভারী বস্তু এক স্থান হতে অন্য স্থানে অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। রেল বা সড়কপথে ভারী বস্তু স্থানান্তরিত করা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি ব্যয়বহুল। পক্ষান্তরে, জলপথে ভারী পণ্য সহজ ও সুলভে স্থানান্তরতি করা যায়। এজন্যই নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে শিল্পজাতপণ্য (বস্ত্র, তৈরি পোশাক, পাট) রপ্তানির প্রয়োজনে নদীপথে পরিবাহিত হয়।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি: বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুলভে পণ্য পরিবহনের কাজে নদীপথ খুবই উপযোগী; দেশের অন্যান্য পথে পণ্যদ্রব্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (সিরাজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ) ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি লাভ করেছে।

৬. বিশ্ববাণিজ্যে জলপথ: বাংলাদেশের বিশ্ববাণিজ্য চলে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে। এ বন্দর দুটি আবার অভ্যন্তরীণ নদীপথের (চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা নদী বন্দর) মাধ্যমে সারাদেশের সাথে যুক্ত।

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা
(Disadvantages of Bangladesh's River Transport)

বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল থাকা সত্ত্বেও এদেশ জল পরিবহণ ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এদেশে নৌ পরিবহণ ব্যবস্থায় নানাবিধ সমস্যা বা অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

১. নদী ভরাট: প্রতি বছর পলিমাটি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে যায়। এর ফলে এসব নদীতে চরের সৃষ্টি হয় এবং নৌযান চলাচলের অসুবিধা হয়। যেমন- পদ্মা নদী।

২. জলযানের অভাব: এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার প্রভৃতির সংখ্যা কম। ফলে অভ্যন্তরীণ জলপথে যাতায়াত ও পরিবহণ কার্য ব্যাহত হয়। প্রায় ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীগণকে নদীপথে যাতায়াত করতে হয়।

৩. জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানার অভাব: বাংলাদেশে জলযান প্রস্তুত ও মেরামতের কারখানা খুবই কম। এটা নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৪. যন্ত্রাংশের অভাব: জলযানসমূহে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না বলে বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। অনেক সময় এসব দ্রব্যের অভাবহেতু বহু নৌযান দীর্ঘ সময় অচল অবস্থায় পড়ে থাকে।

৫. যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার অভাব: নদীপথে যাত্রীদের বিশ্রামাগার ও পণ্য গুদামজাতকরণের সুযোগ সুবিধার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না এবং মালামালেরও ক্ষতি হয়।

৬. ধীরগতিসম্পন্ন জলযান: সাধারণত জলযানের গতি বেশ ধীরে থাকে, তদুপরি বাংলাদেশের জলযানগুলো (আধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনের অভাবে) আরও বেশি ধীরগতিসম্পন্ন। এর ফলে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে অধিক সময় ব্যয় হয়।

৭. নিরাপত্তার অভাব: জলযানগুলো যখন রাতের বেলায় চলাচল করে বা কোনো বন্দরে ভিড়ে তখন নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। নৌরুটে তাই চুরি, ডাকাতি ও দুর্ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে এবং যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।

৮. দক্ষ চালকের অভাব: বাংলাদেশে প্রায়ই লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাবই এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৯. বেতার যোগাযোগের অভাব: নৌ পরিবহণের নিরাপত্তার জন্য ছোটবড় সব নৌযানেই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের নদীপথে সর্বত্র বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

১০. সংকেত ব্যবস্থার অভাব; বাংলাদেশের নদীপথে প্রয়োজনীয় সংকেত ব্যবস্থা নেই। এর ফলে রাতের বেলায় লঞ্চ ও স্টিমার চলাচল করতে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১১. মূলধনের অভাব: জলযান নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। মূলধনের অভাবহেতু বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় জলযান নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তাই এ দেশে জলযানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। নৌ পরিবহন উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ: শুকনো মৌসুমে চ্যানেল ঠিক রাখার জন্য যথাযথভাবে ড্রেজিং করা উচিত।

ড্রেজিং করে অনেক সময় বালু এমনভাবে রাখা হয় যা আবার নদীবক্ষেই আসে। আবার একই গভীরতায় ড্রেজিং না করাও একটা বড় ত্রুটি। নৌপথে নিরাপত্তা, দক্ষ চালক ও সংকেত ব্যবস্থা উন্নয়নে জরুরী পদক্ষেপ দরকার। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই বন্ধ করার জন্যও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ জরুরি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ১৩ বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

যেকোনো দেশের উন্নয়নে সে দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো দেশের মুষ্টিমেয় কিছু অঞ্চলে উন্নয়ন হলেই সে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে এ কথা বলা যায় না। বরং এক অঞ্চলে উন্নয়নের সুফল বা প্রাপ্ত সুবিধা অন্য অঞ্চলে সময়মতো পৌঁছে দিতে পারলেই সমগ্র দেশের মানুষ সেই উন্নয়নের ফল ভোগ করতে পারে। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়। আর কোনো দেশের এক অঞ্চলের প্রাপ্ত সুবিধা, পণ্য বা সেবা অন্য অঞ্চলে পৌঁছে দিতে পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। সর্বোপরি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব ব্যতীত সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা নানাভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন-

ক. কৃষির উন্নয়ন: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষি এবং বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ আসে কৃষিজাত পণ্য থেকে। কৃষিকাজে সময় মতো সার, কীটনাশক, বীজ প্রভৃতি কৃষকের হাতে পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার কৃষক যেন ভালো বা ন্যায্য দাম পায় এজন্য এক অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পরিবহন করার প্রয়োজন হয়। এতে দেশের সর্বত্র পণ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পণ্যের সুষম বণ্টন ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নয়নে পরিবহন ব্যবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

খ. কৃষিজ পণ্যের বিপণন: কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশের সব অঞ্চলে মানুষের প্রয়োজনীয় সব ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় না। এক অঞ্চলে ধান বেশি হলে অন্য অঞ্চলে হয়তো মাছ বা ডাল বেশি উৎপাদিত হয়। আবার কোনো অঞ্চলে একটি বিশেষ শ্রেণির কৃষিপণ্য যে পরিমাণ উৎপাদিত হয়, তা হয়তো সেই অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়েও অনেক উদ্বৃত্ত থাকে। অনেক সময় এক অঞ্চলে হয়তো বা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দাম না থাকলেও অন্য অঞ্চলে দাম বেশি পাওয়া যায়। সে সকল ক্ষেত্রে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে সড়ক, নৌ বা রেলপথে পণ্য সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী জাহাজ ও বিমানযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি, যা আমাদের দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

গ. শিল্পায়ন; কোনো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পের উন্নয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যতীত কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিল্প স্থাপন করতে গেলে ঐ শিল্পের কাঁচামাল প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করা এই দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল পাওয়া না গেলে অথবা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে না পারলে ঐ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সময়মতো কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য দেশের সর্বত্র এবং বিদেশে পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন: ব্যবসা ও বাণিজ্য একটি দেশের উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি পূরণ ও উদ্বৃত্ত সামগ্রী রপ্তানির পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় যা একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। দেশে উন্নতমানের সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বাড়ে। এর ফলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ হয় উন্নত।

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

ঙ. দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায়: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোনো পণ্যের দামের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারলে জনগণের মনের ক্ষোভ ও হতাশা দূর হয়। সবাই একাগ্রচিত্তে নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দিতে পারে। ফলে শান্তি বজায় থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন ঘটে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে কোনো দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। দেশের কোনো একটি এলাকায় কোনো দ্রব্যের সংকট সৃষ্টি হলে সেখানে দ্রুত পণ্য প্রেরণ করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়।

চ. পণ্যের সুষম বন্টন: পণ্যের সুষম বণ্টন কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পৃথিবীতে কোনো একটি দেশের বা একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোনো একটি পণ্যের উৎপাদন আধিক্য বা ঘাটতি থাকতে পারে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে উৎপাদন আধিক্য অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলের দিকে পণ্য পরিবহন করে পণ্যদ্রব্যের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা যায়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রাম ও শহরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দেয়। ফলে কৃষি উপকরণ, ভোগ্যপণ্য, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে দ্রুত গ্রামে পৌঁছানো যায়। ফলে দেশের সুষম উন্নতি সাধিত হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

ছ. শ্রমের গতিশীলতা: আমাদের দেশের সর্বত্র শ্রমিকের মজুরি সমান নয়। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তিও সহজলভ্য নয়। দেশের অনেক অঞ্চলে যেমন- উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর শ্রমিক আছে কিন্তু কাজ নেই। তাই শ্রম অনেক সস্তা। পক্ষান্তরে বড় বড় শহরে শ্রমিকের অপর্যাপ্ততার কারণে শ্রম অনেক দামি। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে শ্রমিকেরা সহজে দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে গমন করতে পারে। এতে তাদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। ফলে দেশের উন্নয়ন সাধিত হয়।

জ. আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনে: পৃথিবীতে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও উন্নয়নের জন্য তাকে অন্য দেশ হতে পণ্য আমদানি ও উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করতে হয়। রপ্তানি পণ্য দ্রুত বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে পাঠাতে এবং আমদানি পণ্য বন্দর থেকে সারা দেশে সময়মত পৌছাতে উন্নত ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে করে আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যায় বলে দেশের উন্নয়ন ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – পরিবহন ও যোগাযোগ

টপিক – ১৪ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

This Topic is important for

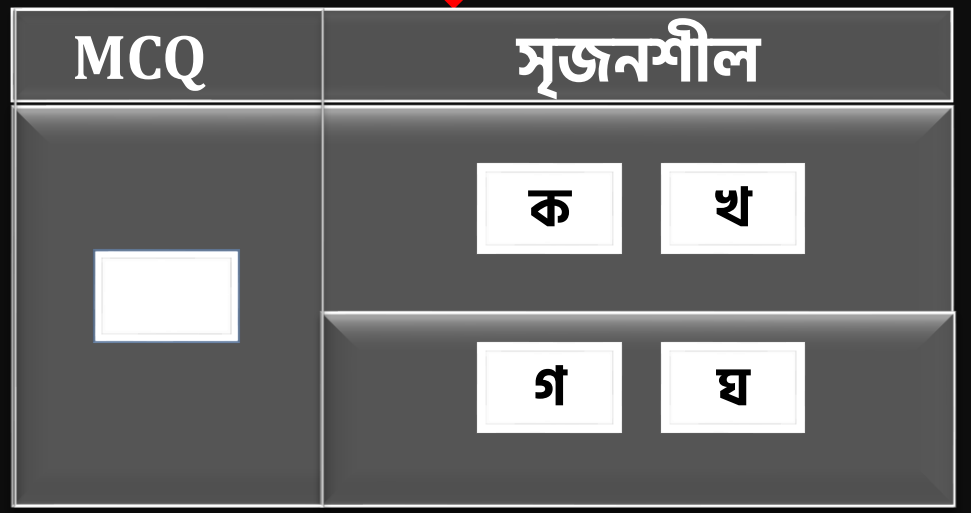

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগে যখন গোটা পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হচ্ছে (Global Village) তখন বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই আর একা চলা সম্ভব নয়। প্রয়োজনের তাগিদেই এক দেশকে অন্য দেশের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে উন্নত দেশের কাতারে পৌছাতে চায় তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ স্থাপন করে বিশ্বায়নের (Globalization) সেই অগ্রযাত্রায় নিজেকে গর্বিত অংশীদার করতে চায়। এজন্য বাংলাদেশ চেষ্টা করছে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় তিনটি মাধ্যমে। যথা- স্থল, জল ও বিমানপথ।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

স্থলপথ (Land Transport)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ক্ষেত্রে স্থলপথ প্রধানতম মাধ্যম হলেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্থলপথ খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ তাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্থলপথকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখনো তা সম্ভব হয়নি। তবে প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হলে চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, ইরান হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে স্থলপথে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুটি উপায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা- ১. সড়কপথ ২. রেলপথ।

i. সড়কপথ: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সড়কপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের অন্যতম অন্তরায়। কেননা বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত এবং একদিকে বঙ্গোপসাগর। দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে যে কয়েক কি.মি. সীমান্ত মায়ানমারের সাথে আছে; সেই অংশটুকু আবার পর্বতসঙ্কুল। ফলে সড়কপথে অন্য দেশগুলোর মধ্যে কেবল ভারতের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ঢাকার সাথে ভারতের কোলকাতা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মধ্যে সরাসরি বাস যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত পথে উভয় দেশের সরকারি বাসের সাথে বেসরকারি শোভনীয় অনেক বাস চলাচল করে। এছাড়া বাংলাদেশের ডোমার, বেনাপোল, দর্শনা, হিলি, বুড়িমারী, বাংলাবান্ধা, তামাবিল প্রভৃতি ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৪টি স্থল বন্দর আছে। এই সকল বন্দরের মাধ্যমে ট্রাকের সাহায্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রধান রুট: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সড়কপথে প্রধান রুট ২টি। যথা-

(i) ঢাকা → যশোর → বেনাপোল → কোলকাতা

(ii) ঢাকা → ব্রাহ্মণবাড়িয়া → আখাউড়া → আগরতলা

ii. রেলপথ: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের রেল যোগাযোগও গড়ে উঠেনি। এদেশের সাথে এক সময় ভারতের সরাসরি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে স্বাধীনতার পরে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও সম্প্রতি অনিয়মিতভাবে আবার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পুনরায় রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবহৃত রেল রুট নিম্নরূপ:

ঢাকা (কমলাপুর) → টঙ্গী → জয়দেবপুর → যমুনা সেতু → ঈশ্বরদী → পোড়াদহ → দর্শনা → গেঁদে →(পশ্চিমবঙ্গ) কোলকাতা

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকায় এবং প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে অনেক বেশি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্র খুবই সম্ভাবনাময়। দুই দেশ যদি নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ দূর করে, তাহলে এই পথে রেল একটি লাভজনক মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

জলপথ (Waterways)

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে একসময় জলপথ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আরামদায়ক এবং খরচ সাশ্রয়ী হলেও সময় বেশি লাগে বলে আন্তর্জাতিক জলপথে বর্তমান সময়ে যাত্রী পরিবহন করা হয়না বললেই চলে। তবে বিশ্বব্যাপী আমদানি রপ্তানি কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ হয় জলপথে। বাংলাদেশের দক্ষিণে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর থাকায় এবং চট্টগ্রাম ও মোংলায় দুটি সমুদ্র বন্দর থাকায় বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সমুদ্র পথকে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করে থাকে। সমুদ্রপথেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৭৫ ভাগ সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিরাপদ এবং অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিশ্বের অনেক দেশের জাহাজ বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে জলপথে ভারত, পাকিস্তান, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, তুরস্ক, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের বড় বড় বন্দরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিমানপথ (Airways)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বিমানপথ খুব বেশি ভূমিকা পালন করতে না পারলেও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বিমানপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এক জনপ্রিয় মাধ্যম। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সরকারি এক আদেশে 'বাংলাদেশ বিমান' নামে জাতীয় বিমান সংস্থা গঠন করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারি ভারতের দেওয়া একটি ডাকোটা বিমান নিয়ে এদেশে বিমানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সরকারের দেওয়া বিমানবাহিনীর একটি ডিসি-৩ এয়ারক্রাফটের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ যাত্রা। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ চট্টগ্রাম ও সিলেটে এবং ৯ মার্চ যশোরে একটি ফ্লাইটের মাধ্যমে আকাশে উড়ে বিমান। এভাবেই শুরু হয়েছিল বিমানের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম। এরপর থেকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি ঐতিহ্যের এ ধারকটিকে। বিমান বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা থেকে ৮টি আভ্যন্তরীণ গন্তব্যে সেবা প্রদান করে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের তিন দিন আগে অর্থাৎ ৪ মার্চ আরিখে ১৭৯ জন যাত্রীকে লন্ডন থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার মাধ্যমে বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সম্পন্ন হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ একটি বোয়িং বিমান সংগ্রহ করে এবং এই বিমানের দ্বারা নিয়মিত আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

এই সমস্ত প্লেনে করে বাংলাদেশ বিমান বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের সাথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে। এগুলো হলো-

1. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

ii. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

iii. ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট।

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিমান বাংলাদেশ আন্তর্জাতি রুটে লন্ডন, ম্যানচেস্টার; রিয়াদ, দাম্মাম, মদিনা, জেদ্দা, কুয়েত, দোহা, আবুধাবি, দুবাই, মাসকট, নয়াদিল্লি, কলকাতা, কাঠমাণ্ডু, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুরে সেবা প্রদান করে। সম্প্রতি ঢাকা-ম্যানচেস্টার, ঢাকা-মদিনা, চট্টগ্রাম-মদিনা এবং সিলেট-লন্ডন বুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা-চেন্নাই, ঢাকা-টোকিও, ঢাকা-টরন্টো এবং ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট পরিচালনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটি সম্মানিত যাত্রীদের চাহিদা বিবেচনায় বিদ্যমান রুটে ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সকল ফ্লাইট চালু হলে দিল্লী, চেন্নাই, কলকাতা, ব্যাকংক, কাঠমাণ্ডু থেকে মধ্যে জাপান, লন্ডন, টরন্টো ও নিউইয়র্ক ফ্লাইটের সংযোগ ফ্লাইট পাবেন যেখানে ঢাকা আঞ্চলিক 'হাব' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। সর্বশেষ হালনাগাদ ২১ এপ্রিল ২০২২, সূত্র: www.biman.gov.bd]

পরিচালনাগত ত্রুটি থাকায় বিমান একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তবে সরকার ও প্রশাসন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বিমান পুনরায় ক্ষতির মাত্রা কাটিয়ে উঠছে। যদি পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বিমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উল্লেখ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২২,৭৬,৭৩৭ জন যাত্রী এবং ৪৩,৯৭৫ টন কার্গো পরিবহন করেছে। এ সময়ে বিমানের আয় হয়- ৪৪০ কোটি টাকা।

THANK YOU